Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501042

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Swadeshi Songs in Rabindra Bhavana of the Nineteenth Century: Tones of Nationalism, Humanism and Self-Power

ঊনবিংশ শতকের আলোকে রবীন্দ্র-ভাবনায় স্বদেশি গান: জাতীয়তাবাদ, মানবতাবোধ ও আত্মশক্তির সুর

Dr. Kaustav Karmakar
Assistant Professor
Sangit Bhavana
Visva-Bharati, Santiniketan

Received on: 17th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

Abstract:

One of the most diverse and significant streams in 19th Century Bengali music is the tradition of Swadeshi or patriotic songs. Among the many emotional and intellectual impulses that inspire human creativity, love for one's motherland occupies a foremost place. From the middle of the nineteenth century, a profound sense of patriotism gradually began to find expression within the recognized musical culture of Bengal. Over time, through different historical phases, this musical tradition expanded extensively, branching out into numerous forms and dimensions.

In the history of Bengali lyrical music, the chapter devoted to patriotic songs is both vast and richly developed. In the context of the social and political realities of the time, this stream of patriotic music came to be identified by various titles such as Swadeshi Sangit, songs of liberation, patriotic songs, or national songs. At one point, the term Swadeshi Gaan became especially popular, although in contemporary usage the phrase 'Swadeshi Sangit' is more widely employed. Therefore, it may be said that those songs through which devotion and deep affection for the motherland are expressed, and through which a firm resolve for the alleviation of the nation's suffering is articulated, are known as Swadeshi music or patriotic songs.

Within this rich musical tradition, the Swadeshi songs composed by Rabindranath Tagore occupy a unique and distinguished place. His patriotic songs are not merely expressions of political consciousness; they are also profound reflections of humanism, cultural unity, spiritual nationalism, and emotional attachment to the soil of Bengal. Through songs such as 'Jana Gana mana Adhinayaka Jaya hey', 'Banglar Mati Banglar Jol,' 'Amar Sonar Bangla,' and 'O Amar Desher Mati,' etc. Tagore transformed the idea of nationalism into an inclusive and human ideal that transcended narrow political boundaries. His Swadeshi songs inspired people during the anti-partition movement of Bengal and awakened within them a deep sense of collective

© Santiniketan Sahityapath

identity, self-respect, and national consciousness.

Accordingly, in this essay we shall attempt to explore the underlying philosophy of patriotism embodied in the Swadeshi songs composed by Rabindranath Tagore in the context of nineteenth–century Bengal, with special emphasis on their literary beauty, philosophical depth, musical expression, and socio–cultural significance.

Key Words:
Hindu Mela, Bengal partition Movement, composition of Tagore's Patriotic songs, Humanism, Nationalism, Social consciousness

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা:

কেবল ভৌগোলিক অবস্থানে অথবা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা দেশের অথবা একটা জাতির পরিচয় নয়, ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত যে প্রাণময় সত্যার অস্তিত্ব সেখানেই তার গৌরব সেখানেই তার মহিমা। এই সত্যটি অন্তরে উপলব্ধি করেই নৈবেদ্য-এর সনেটে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে —

'হে ভারত তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন।'

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনায় সর্বদাই একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভগবতভক্তির প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। মৃত্তিকাময় দেশমাতৃকাকে কবি বিশুদ্ধ সমাজ চেতনার সঙ্গে গ্রহণ করেন নি বরং বিশ্বচেতনার অঙ্গ রূপেই স্বদেশ সত্তা তার কাছে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তার স্বদেশ পর্যায়ের বা জাতীয় সংগীত অধ্যায়ের বহির্ভূত বহু গানগুলিকেও জাতীয় উদ্দীপনার স্মারক হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। তার কাছে দেশপ্রেম কখনো বিদ্বেষ বা বিভেদের শিক্ষা দেয়নি; বরং মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, আত্মশক্তি ও নৈতিক জাগরণের পথ নির্দেশ করেছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণেও গভীর ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের যে গৌরবময় ভূমিকা দেখা দিয়েছিল তার ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে লালিত হয়েছিলেন। মাত্র ১৩বছর বয়সে হিন্দুমেলার সংস্পর্শে এবং ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে তার সুকুমার কবি চিত্তে যে জাতীয়তাবোধ এর স্ফুরণ ঘটেছিল তার পবিত্র চিহ্ন রূপে 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' অথবা 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' গানগুলি নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুন দ্বিগুণ' গানটিকে তাঁর রচিত সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের উদ্দীপক গান হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর গান জনমানসে নবজাগরণের সঞ্চার করে এবং স্বদেশি আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান কেবল সাহিত্য বা সংগীতের সম্পদ নয়, ভারতীয় জাতীয় জীবনের এক অমূল্য সাংস্কৃতিক দলিল হয়ে উঠেছে বলা চলে।

বিষয় আলোচনা:

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশ প্রেমের কারণ হিসাবে বলা যায় রাজনৈতিক বোধ সম্বন্ধে বাঙালি সচেতনতা ও স্বতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠার বোধ সেই সময়কার স্বদেশ প্রেমের প্রধান দুটি উপাদান। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলা থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত সময় রচিত দেশপ্রেমের গানগুলিকেই এক অর্থে প্রকৃত স্বদেশি সংগীত বলা যেতে পারে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বদেশি ঐতিহ্য আত্মসাৎ করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। হিন্দুমেলা এবং সঞ্জীবনী সভা থেকে জাতীয় জাগরণের জন্য যে প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন। তবুও তাঁর প্রথম জীবনের স্বদেশ চেতনার গানগুলিতে

© Santiniketan Sahityapath

স্বদেশের প্রেরণা যতটা সক্রিয় ছিল তার সমকালীন কবি জীবনের প্রেরণা সেই অপেক্ষা কম সকর্মক ছিল না। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'প্রভাতসঙ্গীত' বা 'ছবি ও গান' প্রভৃতি কাব্যে তথা 'মায়ার খেলা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি নাটকে যে আত্মকালীন বিষণ্ণতার প্রভাব ধরা পড়ে তেমনি তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলিতেও ব্যক্তি চিত্তের সেই স্বদেশ গৌরবকে অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়েছে।

তৎকালীন বাংলায় স্বদেশি গানের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এক অর্থে হিন্দুমেলা থেকেই শুরু হয়েছে বলা চলে। অবশ্য পিছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় স্বদেশ নিয়ে রচিত ১৮২৭ সালে প্রকাশিত ডিরোজিওর একটি কবিতাকে ভারতবর্ষে প্রথম স্বদেশি কবিতার রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই পটভূমিতেই বাংলাদেশ কবিতার ও গানের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে একক ঘটনা হিসেবে বাংলার দেশাত্মবোধক গান, এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল হিন্দুমেলা নামে একটি স্বাদেশিক কার্যসূচি। তাছাড়া কলকাতাবাসী কবিদের অনেকেই ছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য বা ভাবশিষ্য। ফলে ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেমমূলক গান রচনা দ্বারা তাঁরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। সুতরাং ক্রমে বহু কবি ও গীতিকার স্বদেশি কথার প্রেরণায় গান রচনা শুরু করেন এবং সবার মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশের দেশপ্রেম নির্ভর গানের ধারাটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে হিন্দুমেলাই ছিল সেই বৃহত্তম ঘটনা যেখানে বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীতের ইতিহাসে তার প্রভাব ছিল সর্বাগ্রগণ্য। মুক্তির গানের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা মূলত প্রায় হিন্দুমেলা থেকে শুরু। রাজনারায়ণ বসুর ধারণার ভিত্তিতে যে একটি মেলার সংগঠন করা সেটিই হিন্দুমেলা নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে তিনি ঠাকুরবাড়িতে অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণে 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থ প্রকাশে জানিয়েছেন যে নবগোপাল মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এর উদ্যোক্তা ছিলেন। তাছাড়া রাজনারায়ণ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সক্রিয়ভাবে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায় এই মেলার শুভ উদ্‌ঘাটন হয়। এই মেলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন যে — 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার রামকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন... মেজদাদা সে সময় 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ভারতের জাতীয় সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।' সুতরাং যে হিন্দুমেলা নবজীবনের পথে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই অনুপ্রেরণার হাত ধরেই মূলত সাহিত্যে ও কাব্যে, গানে দেশবোধপূরণের পটভূমিতে সেই একটি মেলাকে কেন্দ্র করেই বাংলার দেশাত্মবোধক গানের সম্ভাবনাময় সূচনা ঘটেছিল একথা অনস্বীকার্য।

মূল আলোচনার সূত্রপাতে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানগুলিকে তিনটি সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করা যায় — প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ পর্যায় বা হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়ে রচিত গান, দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন স্বদেশি গান রচনা এবং তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে বা বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত গান। প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাতেই স্বদেশি গান রচনার অন্তরালে ঠিক পরাধীনতা না হলেও দেশের বিপন্নতা ও বিপর্যয়ের একটি নির্ভরযোগ আছে। বাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতি অতিলৌকিক সৌন্দর্যবোধ স্বদেশবোধক কবি মনের ধর্ম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাংলার দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীতের সম্ভাব্য বিষয় বিভাগগুলি এইরূপ হতে পারে যথা —

১. সার্বজনীন মানবতার মাহাত্ম্য ও দৈবিক কল্যাণ কামনা বিষয়ক স্বদেশি গান
২. ভারত সংগীত
৩. বঙ্গ সংগীত
৪. প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের বর্ণনামূলক গান
৫. ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরব ঘটিত স্মৃতিচারণার আঙ্গিকে গান
৬. পরাধীনতার জন্য খুব প্রকাশ এবং পূর্ব গৌরব মুক্তির জন্য লজ্জা নৈরাশ্য ও জাগরণের মৃদু আহ্বানমূলক বিষয়ক গান
৭. সমসাময়িক ঘটনা আশ্রিত বিষয়ক গান
৮. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের লক্ষণাশ্রিত বিষয়ক গান
৯. ঐক্য শক্তির মাহাত্ম্যমূলক বিষয়ক গান

© Santiniketan Sahityapath

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বাংলা ভাষায় লেখা দেশাত্মবোধক গানের তৎকালীন সমাজে সাধারণত তিন ধরনের সুরের প্রচলন ঘটেছিল। যথা রাগ-রাগিণী আশ্রিত সুর, লোকসংগীত আশ্রিত সুর, বিদেশি বা ব্যান্ডের সুর যদিও পরবর্তীকালে স্বদেশি গানে নানা প্রকার মিশ্র সুরেরও প্রয়োগ শোনা যায়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ও সংগীতের যে দেশপ্রেম চেতনার বিপুল আয়োজন হয়েছিল তা কিশোর রবীন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি মনোভাব ও স্বদেশি সংগীত রচনার বিকাশ ঘটে এই সময় থেকে। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে ১৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপহার হিসেবে কবিতা ও আবৃত্তি পাঠ করেন। মেলার শেষের দিকের কোনো কোনো অধিবেশনে তিনি স্বরচিত দেশাত্মবোধক গানও পরিবেশন করতেন। তবে কোনো অধিবেশনে তিনি কোন্ গান পরিবেশন করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এই সময় ঠাকুরবাড়িতে যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগে যে 'সঞ্জীবনী সভা'র গঠিত হয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার সদস্য। হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার স্বদেশিকতা তরুণ রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশাত্মবোধক গান রচনায়। এই পর্বে তিনি বেশ কিছু গান রচনা করলেন —

১. তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
২. এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
৩. ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
৪. ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা জলদে
৫. অয়ি বিষাদিনী বীণা

উপরিলিখিত গানগুলির মধ্যে ভৈরবী সুরে তিনি রচনা করেছিলেন 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমানুরাশি' গানটি। এই গানে স্বাধীনতার জন্য তরুণ কবির মনে এতটুকু উদ্যম প্রকাশ পায়নি — প্রকাশিত হয়েছে কেবল নৈরাশ্যের দীনতায় অশ্রুমোচন। কিশোর কবির স্বদেশ চিন্তায় মাতৃভূমির অস্তিত্বই যেন বিলুপ্ত। তারই প্রতিফলন ঘটেছে আরো একটি গানে — 'শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু দয়াময়।' অথচ এইসব গান রচনার সময় বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার দমন পীড়নে তখনো অবস্থা এমনও ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি যেখানে জনসাধারণের বাক্-স্বাধীনতা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বা কোনো প্রকার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে দমনীয় হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার এই জাতীয় গানগুলি পাঠ করলে এই ভাবটি অবলীলায় ফুটে ওঠে অর্থাৎ যেন একথা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে স্বদেশ প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েও গান রচনার ক্ষেত্রে কবি নিজস্ব নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার দ্বারা আক্রান্ত। অধিকাংশ গানেই কবি দেশাত্মবোধক গানের উদ্দীপনার ও মাতৃমহিমার সুরটি গ্রহণ না করে একপ্রকার আত্মকেন্দ্রিক দুঃখ কৈবল্যের সুর গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে রচিত বেশ কিছু গান যেগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসংগীত সংকলন থেকে বর্জিত হয়েছিল যেমন — 'ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা' বা 'মায়ের বিমল যশে' প্রভৃতি গান।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এই গানটি পরিবেশন করা হয়। রামপ্রসাদী সুরের কাঠামোয় রচিত এই গানটিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতি উদার আহ্বান জানানো হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক একতার আহ্বান জানানো হয়েছিল যেসব গানে তাদের বলা হতো মিলন সংগীত। এই সাম্প্রদায়িক মিলন বলতে প্রধানত হিন্দু মুসলিম ঐক্যকেই বোঝানো হতো। এমনকি কোনো কোনো গানে হিন্দু মুসলিমের এই কথা দুটি উহ্য থাকত যেমনটা ছিল রবীন্দ্রনাথের মিলন গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটিতে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বকালে রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে রসগত উৎকর্ষের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো —

১। 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'
২। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
৩। 'আমায় বলো না গাহিতে বলো না'
৪। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'

© Santiniketan Sahityapath

১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের দ্বাদশ কলকাতার অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সুরে গাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্' গানটি। তখন থেকেই স্বদেশি সংগীত রূপে 'বন্দেমাতরম্' গানটির যাত্রা শুরু। ক্রমে এই গানখানি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বিশিষ্ট সংগীতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৯৭ সালের রবীন্দ্রনাথ আরো দু'খানি গান রচনা করেন যথা — 'অয়ি ভুবনমোহিনী' এবং 'কে এসে যায় ফিরে আকুল নয়ন নীরে।' বঙ্গাভঙ্গের পূর্বের রচিত স্বদেশি সংগীত রচনার প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ গানই রাগরাগিণী সংগীতের সুরের ভিত্তিতে সুরারোপিত হয়েছে যেমন — ললিত, বিভাস, ভৈরবী, ইমন, মল্লার, সিন্ধু, কাফি, বাগেশ্রী, সাহানা, জয়জয়ন্তী তিলোককামোদ, বসন্ত, বাহার প্রভৃতি। এছাড়া দুই একটি রামপ্রসাদী সুরের গানও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীত রচনা প্রথম যুগে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা যে খুবই অস্পষ্ট ছিল সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। তাই প্রাথমিক যুগের কোনো স্বদেশি গান জাতীয় আন্দোলনকে সেই ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে এবং বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় কবি অংশগ্রহণ করেছেন। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, প্রবন্ধে এমনকি জাতীয় জীবনেও নানা অধ্যায়ে তার স্পর্শ লেগেছে। এর পাশাপাশি সাধনা বা বঙ্গাদর্শন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা এবং সামাজিক মনস্কতার বহু উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছে। 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে', 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু', 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে' এইসব গানগুলিতে স্বাদেশিকতার ঠিক সেই রকম উন্মাদনা নেই যা পরাধীন ধমনীকে উত্তাল করে তুলতে পারে। বস্তুত এই পর্বে রচিত বেশিরভাগ গানই কোনো-না-কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে অথবা কারোর অনুরোধে লিখিত। তাই কবি মনে স্বত উৎসারিত প্রেরণা এখানে সেভাবে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গৌরবের সংগীত রচনা শ্রেষ্ঠ কাল হলো বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলন। বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিপুলসংখ্যক গান রচিত হয়েছিল তার মুখ্য সংগীতকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অমৃতলাল বসু, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনমোহন চক্রবর্তী-সহ সকল সমকালীন বাঙালি গীতরচয়িতারা বঙ্গাভঙ্গের গান রচনা করলেও বঙ্গাভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশি সংগীতগুলিই এক অনন্য অদ্ভুত উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল বাঙালির হৃদয়ে। যে বঙ্গা রাষ্ট্রশক্তির ষড়যন্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুখে বিপন্ন হতে যাচ্ছে তার খণ্ড নিবারণের জন্য কোনো উত্তেজিত তীব্র ধিক্কার নয়, বরং অকম্পিত কণ্ঠে বঙ্গের মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে বঙ্গা তার আম্র মঞ্জরীর ঘ্রাণে আঘ্রাণে শস্য বিকাশে বা নদী তটে ধেনু চলা প্রান্তরে সন্ধ্যার প্রদীপ শিখায় কবির মুগ্ধ চিত্ত সম্বলিত শাশ্বত মূর্তিতে বিরাজ করে, সেখানে মোটা কাপড়ের জন্য রজনীকান্তের প্রতীক্ষা গীত বা মনমোহনের কাচের চুড়ি ফেলে দেওয়ার জন্য বঙ্গানারীর প্রতি কাতর প্রার্থনা অথবা কালীপ্রসন্নের বরিশালের ওপর শারীরিক আঘাতের জন্য বিকৃত তিরস্কার সব ছাপিয়েই উঠল বৈরাগী একতারা কবি বাউলের গান। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান আন্দোলনের সমস্ত চিৎকার উত্তেজনার মাঝখানে চিরশ্রী বঙ্গের মূর্তি উজ্জ্বল প্রদীপ শিখার মতো তাঁর আত্মার প্রগাঢ় বিশ্বাসে অকম্পিত থেকেছে। বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত গানগুলির সামগ্রিকভাবে নতুন আঙ্গিকে রচিত দেশবন্ধনার অতি বিচিত্র রূপ পূর্ববর্তী আর কারোর রচনায় সেভাবে পাওয়া যায় না। কোনোটিতে বাংলা মায়ের শ্যামল কোমল রূপ বর্ণিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো গান বঙ্গাভঙ্গ রদ করার ভঙ্গিতে দৃপ্ত হয়েছে। অবশ্য এ কথা বলা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক যে যদিও এই পর্বে আসমুদ্র হিমাচল বঙ্গাভূমির প্রাণবন্ত ব্রিটিশ বিরোধী রূপ বা তার সাহিত্য বা সংগীতে ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তবুও মাতৃভূমি মাতৃভাষা ও স্বদেশ সম্পদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তথা সার্বজনীন ঐক্যবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা এইগুলিকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর সংগীতে রূপদান করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন জনপ্রিয় স্বদেশি গানগুলি পরোক্ষভাবে আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গাভঙ্গির অনুমতি দান করার পূর্বেই যখন সরকারি সিদ্ধান্তে বঙ্গাভঙ্গের দিন ঘোষণা করা হলো তখন থেকেই দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মানুষের নানান প্রবন্ধে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও বিদেশের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে অন্যান্য কবিদের মতো তীব্র ভাষায় সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রা চিহ্নের ছবি তাঁর গানে নেই। বরং তাঁর রচিত গান দিয়ে তিনি আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ মুহূর্তকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

© Santiniketan Sahityapath

বঙ্গভঙ্গ সমসাময়িক পর্বে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে রচিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গান হলো — 'সার্থক জনম আমার', 'আমার সোনার বাংলা', 'ও আমার দেশের মাটি', 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', 'এবার তোর মরা গাঙে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'যে তোরে পাগল বলে', 'যদি তোর ভাবনা থাকে', 'আপনি অবশ হলি', 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে', 'ছিঃ ছিঃ চোখের জলে', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' প্রভৃতি গান। এই গীতরচনাগুলির মূল বৈশিষ্ট্যই হলো যে গানগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় সৃষ্টি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এইসব গানে অত্যন্ত গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের সময়ে রচিত বঙ্গভঙ্গ কালে দেশাত্মবোধক গানগুলি বাঙালির চিরকালীন স্বদেশি সংগীত রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এই যুগে রচিত অধিকাংশ গানে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের সুর সংযোজিত করেছেন। বঙ্গভঙ্গের রচিত ২৩টি দেশাত্মবোধক গানে কবি প্রধানত বাউল ও সারি গানের মতো সহজিয়া সুরের প্রয়োগ করেছেন। কারণ এই সময়ে রচিত গানগুলির কথা ও সুরের সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দই দেশবাসীকে এই আন্দোলনে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ ও প্রয়াস নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মিলিত পরিকল্পনায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। এই মিলন সাধন কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গান রচনা করেছিলেন কবি নিজেই অর্থাৎ 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল।' পাশাপাশি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচনা করলেন, 'বঙ্গালক্ষ্মীর ব্রতকথা' যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূল বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে থাকে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের কথা। রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন — 'আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।' যাতে কোনো চক্রান্ত কখনো না বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে সেই মূর্তিই আমরা দেখতে পাই 'আমার সোনার বাংলা', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' প্রভৃতি গানে। 'আমি ভয় করব না' বা 'যদি তোর ভাবনা থাকে', 'ছি ছি চোখের জলে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'তোর আপন জানে ছাড়বে তোরে' গানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে প্রতিটি গানই কিন্তু একক কণ্ঠের — সমবেত ঘোষণার গান নয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ অধিক মাত্রায় স্বদেশি সংগীত রচনা করেছিলেন যদিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর জাতীয় উত্তেজনা থেকে কবি সরে এসেছিলেন। বাংলার স্বদেশ ভাবাত্মক সংগীতের সামগ্রিক তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর কয়েকটি গান সাধারণভাবে বাংলার সৌন্দর্য, তার স্মরণীয়তা ও নমনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। গানের সুর সর্বত্র হয়তো বলিষ্ঠ নয়। কারণ তাঁর গানগুলি দেশপ্রেমের একক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমবেত উত্তেজনায় উদ্দীপিত নয়।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে লিখিত ও প্রকাশিত গানগুলির মধ্যে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এবং 'সার্থক জনম আমার' গান দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গানটি 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় এবং দ্বিতীয় গানটি 'বাউল' নামক দ্বিতীয় সংকলনে প্রকাশিত হয়। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' ও 'আমার সোনার বাংলা' এই দুটি গান সমসাময়িক। এর কিছুকাল আগে রচিত 'অয়ি ভুবন মোহিনী' গানটিতে কবি বঙ্গজননীর অতুলনীয় মূর্তি অঙ্কিত করেছেন। এই গানটির রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে জানা যায় যে দশভুজার সঙ্গে দেশমাতৃকার মূর্তিতে মিলিয়ে দিয়ে একটি গান রচনার অনুরোধ করা হয়েছিল কবিকে। ধর্মের দিক দিয়ে মেনে নিতে না পারলেও কবি গানটি রচনা করেছিলেন। এই গানে মাতৃমূর্তির যে ঐশ্বর্যময়ী মায়ের প্রতিমা কবি সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যের দিক থেকে তার তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সার্থক জনম আমার' গানটি একেবারেই অন্য ধরনের গান। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় এই জন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার গান বলা যায় । একটি ক্ষণজন্ম আবেগকে একটি গানের দূরপ্রসারী সুরে সঞ্চার করে দেওয়ার সেই অনুভূতিকে অপরের চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার সার্থক সংগীত ভৈরবী রাগের আঁধারে রচিত 'সার্থক জনম আমার' গানটি।

স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমরা সবাই রাজা' গানটি 'রাজা' নাটকের গান, 'রইলো বলে রাখলে তারে' 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গান। জাপানি জুজুৎসুর প্রদর্শনকালে ১৯৩১ সালে এই স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রতি উৎসাহ আধিক্যের জন্য কবি রচনা করেছিলেন আরো একটি গান 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা'। স্বদেশ পর্যায়ের আরেকটি গান 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়' সাধারণ ভাবে উদ্দীপনার গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে অর্থাৎ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত নয় গানটি। 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে'

© Santiniketan Sahityapath

গীতাঞ্জলির গান। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি রচিত। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এবং 'মাতৃ মন্দির পুণ্য অঙ্গান' গান দুটি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা। 'চলো যাই চলো যাই' এবং 'শুভ কর্মপথে ধরে নির্ভয়' গান এই দুটি গান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৯৩৮ সালের রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গো আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হলো 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা', 'সর্ব খর্ব তারে দহে', 'শুভ কর্মপথে ধরো' — এই গানগুলি কিন্তু একেবারেই বঙ্গাভঙ্গার পরবর্তী সময় রচিত অর্থাৎ স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনার তৃতীয় পর্ব।

উপসংহার:

পরিশেষে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলির পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় — **প্রথমত:** রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গো বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তারপর ধীরে ধীরে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনেন এবং নিরপেক্ষ দর্শকের মতো ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য রচনা করে চলেন শেষ জীবন পর্যন্ত। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি মাতৃভূমি স্বাধীনতা ও গণমুক্তি প্রতি একান্ত অনুরপ্ত থেকে কবি আমাদের রাজনৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন, দেশনায়কদের কার্যাবলির বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে না থাকার জন্য তেমন করে আর স্বদেশি গান সৃষ্টি করেন নি।

দ্বিতীয়ত: জীবনের পরবর্তী অধ্যায় নানা সময় রচিত কবির বহু গান স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সাধারণভাবে জাতীয় জাগরণের গান বা প্রগতির গান হিসেবে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ সেই গান দুঃসহ পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলনের প্রেরণা থেকে উৎসারিত নয়।

তৃতীয়ত: রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গানে লোকায়ত সুর ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানগুলি এইসব লোকগীতি শুনেই জনগণের হৃদয় আন্তরিকভাবে স্পর্শ করেছিল। যে সমস্ত গানে তিনি রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেগুলি তাদের জটিলতা এবং সহজগম্যতা ও বোধগম্যতার অভাবের জন্য ততোটা জনপ্রিয় হতে পারেনি।

চতুর্থত: রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার সঙ্গো ধর্মবোধ, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বর চেতনার এক অঙ্গাঙ্গিক যোগ রয়েছে। ইতিহাস বিধাতার এক অমোঘ সত্যের বিধানে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব অর্জন সম্ভব হবে অর্থাৎ মনুষত্বঘাতী বর্বর প্রভুর দাসত্ব যে চিরস্থায়ী হতে পারে না এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন যা তাঁর স্বদেশাশ্রয়ী সংগীত ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমমূলক গানগুলির দিকে লক্ষ করলে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের দিকটির বদলে চিরকালই ভারতবাসীর আত্মনির্ভরতার উপর জোর দিতে বলেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতেও এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে তিনি স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা বারবার আমাদের স্বনির্ভরশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় — 'আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি'।

সুতরাং হিন্দুমেলার যুগ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশি যুগ পর্যন্ত স্বদেশ চেতনা প্রধানত গানের মাধ্যমেই পরিস্ফুটি হয়েছিল যেখানে সর্বাধিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চল্লিশ বছরের বেশি এই সময়কালে অসংখ্য কবি ও গীতিকার গান রচনা করলেও এই সময়কালে যাঁর গানের সংকলন হয়েছিল বিপুল সংখ্যায় — তিনি আমাদের সকলের দেশ, কাল, সাম্য ঐক্য, মিলন ও জাতির কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

© Santiniketan Sahityapath

সহায়ক গ্রন্থ:

১. কিরণশশী দে, ‘সংগীতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রীতি’, ‘রবীন্দ্র সংগীত সুষমা’, দে’জ পাবলিশিং
২. করুণাময় গোস্বামী, ‘দেশাত্মবোধক গান, ‘বাংলা গানের বিবর্তন’, প্রতিভাস, কলকাতা
৩. অরুণকুমার বসু, ‘বাংলা স্বদেশচেতনাশ্রয়ী গানের ইতিহাস’, ‘বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত’, দে’জ পাবলিশিং
৪. আশীষকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম’, ‘রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৯’, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘স্বদেশ পর্যায়’, ‘গীতবিতান’ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

—

Prantik Gabeshana Patrika